ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- III, January, 2025, Page No. 753- 761
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.065

নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে কর্ণ-কুন্তী কথার বিবর্তন

সঞ্চারী হালদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Mahabharata, the great epic of India has encouraged people to think afresh throughout the ages. The story and characters of Mahabharata has been mentioned several times in modern Bengali short stories, to express the tone of time and society. Modern society wants to judge Mahabharata as a book of social experience. In the present article, four short stories are selected for discussion. They are based on the relationship of Karna and Kunti. The names of the texts are 'Kounteya' by Subodh Ghosh, 'Kunti Songbad' by Samaresh Basu, 'Karna-Kunti Katha' by Jyotirmoyee Devi and 'Adhirath Sutaputra' by Amalendu Chakraborty. Kunti and Karna are two very important characters of Mahabharata. In these modern stories, Karna is mostly represented as a lonely man of modern times, who is suffering from existential crisis and Kunti represents the virgin mother who sacrificed his child for social dogma. The dialectic relationship between the mother and son has repeatedly evoked modern writers. Those Bengali writers gave new significance to Karna and Kunti by analyzing it from different perspectives. They try to uncover the true essence of the characters by filling the gaps in classical literature. In this process the past is re-examined by judging events from a modern perspective. Besides, the characters of present society have been compared and recognized in the light of Mahabharata. These Mahabharata-centric works occupy a special place in the trend of post-independence Bengali fiction practice.

Keywords: Mahabharata, Short stories, Deconstruction, Reconstruction, Karna, Kunti, Modern, Existential crisis, relationship.

মহাভারত ধারণ করে আছে ভারতীয় জাতির সহস্রাধিক বছরের কর্মের ইতিহাস, মর্মের ইতিহাস। বহু যুগ ধরে বহু মানুষের অভিজ্ঞতা মিলিত হয়ে এই মহাগ্রন্থের বর্তমান 'শতসাহস্রী সংহিতা'-র অবয়বটি গড়ে উঠেছে। সভ্যতার ঊষালগ্নে কোনো এক মহাকবি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনি, প্রচলিত লোককথা এবং প্রাচীন সংগীত-আলেখ্য এক সূত্রে গ্রথিত করে গড়ে তুলেছিলেন মহাভারতের মতো এক বিশেষ সাহিত্য সংরূপ। সংরূপের বিচারে সমালোচকেরা একে আদি মহাকাব্য বা 'Epic of growth' বলে চিহ্নিত

করেছেন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী মহাকবি বেদব্যাসের হাতে মহাভারত সংহত রূপ লাভ করলেও তাকে একক কবির সৃষ্ট রচনা বলা যায় না। বহুদিন ধরে বহু কবির সংযোজনের ফলে বহু উপকাহিনি একটি মূল কাহিনিতে এসে মেশার ফলে মহাভারত হয়ে উঠেছে এক বিস্তৃত সময় ও সভ্যতার দর্পণ। একটি বিশেষ যুগ ও জাতির মুখপাত্র হয়ে উঠেছে এই মহাকাব্য।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় মহাভারত-চর্চার সূচনা হয়েছিল। এই ধারায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রমুখ। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে অনুবাদের পাশাপাশি প্রবন্ধ এবং কাব্য, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের বিশেষ সংরূপে এবং বিংশ শতাব্দী থেকে উপন্যাস-ছোটোগল্পের পরিসরেও মহাভারতের পুনর্নির্মাণ জারি থেকেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে আধুনিক যুগের বহু প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিকই তাদের মননচর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন মহাভারতকে।

আধুনিক সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের যেকোনোরকম প্রয়োগ হল **পুনর্নির্মাণ**। এই পুনর্নির্মাণের ভিত্তি মহাভারত হলেও আধুনিক লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা, কালচেতনা, সাহিত্যচেতনা, জীবনদর্শন, ভাষাবোধ, শৈলী— এই সবের উপর নির্ভর করে সেই সৃষ্টি হয়ে ওঠে নবনির্মাণ। কথাসাহিত্যিকগণ মহাভারতের আলোয় সমকালকে চিনতে চান, মহাভারতীয় ঘটনার আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতকে পুনর্বার যাচাই করে নিতে চান এবং পাশাপাশি ধ্রুপদী সাহিত্যের ফাঁক পূরণ করে চরিত্রগুলির মর্মকথা উদঘাটনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এবং এই প্রক্রিয়ায় অনেকসময় মহাকাব্যিক চরিত্র বা ঘটনার বিনির্মাণ ঘটে যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কয়েকটি স্বতন্ত্র ধারাক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। **একটি** ধারায় কথাসাহিত্যিক মহাভারতের মূল কাহিনিসূত্রের কোনো রদবদল না করে ঘটনার নতুন এবং যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে সম্ভাবনাগুলি পরিস্ফুট করে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। অনেক সময় লেখকগণ মহাভারতের ধ্রুপদী মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে লঘু ঘটনার মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশনা করেন। দ্বিতীয় ধারায় আছে আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা সেই জাতীয় গল্প উপন্যাস যেখানে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্রের প্রতীকী ব্যবহার বা ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন করা হয়। মহাভারতের অনেক ঘটনা, পরিস্থিতি ও চরিত্র মানবমনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই আধুনিক সাহিত্যে মহাকাব্যের পরিচিত ঘটনার উল্লিখনে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করে। এইসব কথাসাহিত্যের উৎস প্রত্যক্ষভাবে মহাভারত থেকে গৃহীত না হলেও মহাভারতীয় প্রসঙ্গ ও প্রতীক ব্যবহার রচনাটিকে অন্য মাত্রা দান করে। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে এই দ্বিতীয় ধারার কথাসাহিত্যের উপর মনোনিবেশ করা হয়েছে।

প্রাগাধুনিক যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মহাভারতের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া জারি আছে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে রচিত আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পে একাধিকবার মহাভারতকে উপলক্ষ্য করে সময় ও সমাজের স্বর উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র যেমন নতুন আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে; তেমনই বহু ঘটনা নতুনভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং অমলেন্দু চক্রবর্তী রচিত চারটি ছোটোগল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে মহাভারতের কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন ঘটেছে।

মহাভারতের কুন্তী এবং কর্ণের সম্পর্কের দ্বান্দ্বিকতা ও জটিলতা বারংবার আধুনিক লেখকদের প্রাণিত করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৩০৬) হোক বা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩)— যুগে যুগে কর্ণ এবং কুন্তী চরিত্র নিয়ে ভাঙাগড়া জারি আছে। সরাসরি মহাভারত প্রসঙ্গের অবতারণা না করেও আধুনিক গল্পকারেরা কুমারী মাতা ও কানীন পুত্রের অনুষঙ্গে কুন্তী ও কর্ণ চরিত্রের প্রতীকী উল্লেখ করেছেন। এই সব গল্পে কর্ণ মহাভারতের যুগ পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বর্ণিত হয়েছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্বরাত্রে কুন্তী কর্ণের কাছে তাঁর জন্মপরিচয় উন্মোচন করেছিলেন। কুমারী মাতার সামাজিক লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে পুত্রের কাছে এই যে পরিচয় জ্ঞাপন— এর পিছনে কাজ করেছিল পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত ও সুবিধাবাদী মনোভাব। কর্ণ তা বুঝে কুন্তীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সখা দুর্যোধনের বিপদের দিনে তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের কথা ভাবতে পারেননি। তবে তাঁর স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয় মাতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকারও করতে পারেনি। তিনি কথা দিয়েছিলেন, সমর্থ হলেও তিনি অর্জুন ছাড়া অপর কোনো পাণ্ডবকে হত্যার প্রচেষ্টা করবেন না। যুদ্ধে কর্ণ বা অর্জুন, যারই মৃত্যু হোক, কুন্তীর মোট পাঁচ পুত্রই শেষপর্যন্ত জীবিত থাকবে। মাতা-পুত্রের সম্পর্কের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' কাব্যনাট্যে।

কাব্যনাট্য **'কর্ণকুন্তীসংবাদ'**-এর কাহিনি গৃহীত হয়েছে মহাভারতের উদ্যোগপর্ব (১৪৫-১৪৬ অধ্যায়) থেকে। এই পর্বে কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাবকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন শুধু তাই নয়; যুদ্ধের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে কুন্তী কর্তৃক দলবদলের অন্যায্য অনুরোধকে অধার্মিক বলেও চিহ্নিত করেছিলেন। মাতা কুন্তীকে তাঁর পূর্ব কর্মের জন্য কটুভাষন করতেও কর্ণ ছাড়েননি—

> "আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে করি না। আপনি আমাকে ত্যাগ ক'রে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হ'লেও আপনার জন্য আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার পাই নি, কোন শত্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারে? আপনি যথাকালে আমাকে দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন।"[১]

কিন্তু 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' কাব্যনাট্যে কর্ণ এত রূঢ়ভাষী নন। নিজ পরিচয় জানার পর আজীবন মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত কর্ণের স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় উদ্বেল হয়েছে— "সত্য হোক, স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী/তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে/রাখো ক্ষণকাল।..."[২] একদিকে আজন্মবঞ্চিত মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা; অন্যদিকে বন্ধুর প্রতি কর্তব্য এবং ন্যায়পরায়ণতা— এই দ্বন্দ্ব কর্ণ চরিত্রটিকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। 'বিদায় অভিশাপ'-এর কচের মতো কর্ণ শেষপর্যন্ত কর্তব্যকেই মান্যতা দিয়েছেন। তিনি মাতা কুন্তীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তিনি অসময়ের সুহৃদকে ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেননি। মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে একক মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব নয়, সূতপুত্রের পরিচয়কেই তিনি শেষপর্যন্ত মান্যতা দিতে চেয়েছেন—

> "মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা,
> তার চেয়ে নাহি মোর অধিক গৌরব।"[৩]

কৌরবদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও তিনি পক্ষ বদল করতে চাননি। 'পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—' [৪] নিঃসঙ্গ একাকীত্ব তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাচন। স্বেচ্ছায় তিনি ঘোষণা করেছেন— 'আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে'[৫]। কর্ণ এখানে মহাভারতের যুগ পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রভাবনায় কর্ণ চরিত্রে আরোপিত হয়েছে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট। তাঁর কাব্যনাট্যে নিজের মাতৃপরিচয় জানার জন্য কর্ণের আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে— "কহো মোরে/ জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে/ তোমা সাথে হে অপরিচিতা!"[৬] অস্তিত্বের সংকটের এই মৌল স্বরূপটি **সুবোধ ঘোষকে** (১৯০৯-১৯৮০) **'কৌন্তেয়'**-এর মতো গল্প লেখার জন্য প্রাণিত করে থাকতে পারে। 'কৌন্তেয়' শব্দের অর্থ কুন্তীর পুত্র। এক্ষেত্রে গল্পের শিরোনামে কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমগ্র গল্পে কোথাও সরাসরি মহাভারত প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। শুধু নামকরণের মাধ্যমে মহাভারতের চরিত্রটিকে নব ভাবনায় ব্যঞ্জিত করা হয়েছে।

গল্পের প্রধান চরিত্র মাধব দত্ত, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। জার্মানি থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় এক কারখানায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করে। মাতা-পুত্রের নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনে হঠাৎ রাহুর মতো আবির্ভাব ঘটে মিস সুহাসিনী পলের। এই রহস্যময়ী বৃদ্ধা শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে চ্যারিটির জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে, যা একপ্রকার ভিক্ষারই নামান্তর। সবাই যেখানে তাকে এক দু-আনা অর্থ সাহায্য করে, সেখানে মাধব দত্ত প্রথমবার তাঁকে আট আনা দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার সেই বাড়িতে আবার গেলে মাধবের মা সুহাসিনীকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। চ্যারিটির টাকায় মদ কিনে খাবার কথা প্রকাশিত হয়ে গেলে লজ্জায়, অপমানে সুহাসিনী পল প্রতিশোধ নেবে বলে ঠিক করে। তার এই প্রতিশোধ গ্রহণের খেলায় মাধবকে ঘুঁটির মতো ব্যবহার করতে চায় ধূর্ত বৃদ্ধা। মাধবকে মিথ্যা পরিচয় জানায় যে, সে তারই কুমারী জীবনের সন্তান—

> "সে যে আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটা ভুল ভালোবাসার লজ্জা। সম্মানের ভয়ে আমার সন্তানকে চুপে চুপে অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল।"[৭]

মূল মহাভারতেও কুন্তীর মুখে শোনা গেছিল যে কুমারী থাকাকালীন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন বলেই তাঁকে পরিত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। মহাযুদ্ধের পূর্বরাত্রে কুন্তী কর্ণের কাছে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর জন্মপরিচয়। দু-টি ঘটনার পার্থক্য হল মহাভারতে কুন্তীর স্বীকারোক্তি ছিল সৎ। কিন্তু আলোচ্য গল্পে মাধব দত্তের মায়ের উপর প্রতিশোধস্পৃহা থেকে করা সুহাসিনী পলের উক্তিতে কোনো সত্যতা ছিল না। মাধব ঘোষ একপ্রকার নিশ্চিত যে অর্থের লোভেই মিস সুহাসিনী পল মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে। কিন্তু তারপরেও দ্বিধাদীর্ণ হয়েছে তার মন। সুহাসিনীর বলা কথাগুলো সে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারে না—

> "বুড়ির গল্পটা যেন মাধবের শরীরের রক্তের মধ্যে গোপন কৌতুকের মতো সিরসির করছে। সেই ভুয়ো গল্পটা যেন ঠাট্টা করে বলছে, আহা, এখন এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরে কোন্ অলিগলির ভিতর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে মাধবের সত্যিকারের মা, বেচারা ঐ সুহাসিনী পল!"[৮]

কুন্তী এবং সুহাসিনী— দু-জনেই পুত্রের কাছে নিজের পরিচয় উন্মুক্ত করেছেন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। দু-ক্ষেত্রেই মায়ের স্বীকারোক্তিতে সন্তানের তথাকথিত নিস্তরঙ্গ জীবন বিস্ময়-বিপন্ন হয়েছে। 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ কর্ণের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল আজন্ম না দেখা মায়ের প্রতি এক স্নেহবুভুক্ষু পুত্রের অমোঘ টান—

"পুরাতন সত্যসম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।"[৯]

সুবোধ ঘোষের গল্পটিতে দেখা যায়, এন্টালি বাজারে হঠাৎ দেখা হওয়ার পরে মাধব সুহাসিনীর বাড়ি গিয়ে চা-পাউরুটি খেতে রাজি হয়েছে। সেখানে সুহাসিনী পলের কেবিনের গর্তে "একটা শিশু-প্রাণের মতো ধুকপুক করে মাধবের ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণ। চট জড়ানো বিছানার একটা নোংরা স্তূপ, তোবড়ানো একটা টিনের বাক্স, আর একরাশ ছেঁড়া ছেঁড়া জামাকাপড়, ঘরের জিনিসগুলো যেন আবছা অন্ধকার জড়িয়ে পিণ্ড পিণ্ড মাংস আর নাড়ির মতো মাধবের প্রাণের চারদিক জুড়ে বেদনাভরা জন্মলোকের জঠর রচনা করে রেখেছে।"[১০] অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নে এভাবেই মহাভারতের কৌন্তেয়-এর সঙ্গে তাঁর গল্পের মাধব দত্তের অভিন্নতা কল্পনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। কর্ণ শেষপর্যন্ত মাতৃ-আহ্বানে সাড়া দেননি। মাধব দত্ত সুহাসিনীর আচরণে সাময়িকভাবে বিমূঢ় হয়ে গেলেও শেষপর্যন্ত তাকে অস্বীকার করেছে।

কুমারী মাতার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে **সমরেশ বসু**র (১৯২৪-১৯৮৮) **'কুন্তী সংবাদ'** গল্পে। মহাভারতের কুন্তী লোকলজ্জার ভয়ে নিজের প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। এমনকি মৃত্যুর আগে তাঁর পরিচয় জনসমক্ষে প্রকাশও করেননি। কিন্তু বর্তমান গল্পের কুমারী মাতা ভিন্ন পথের পথিক। দেহাতি মেয়ে মুনিয়া অচেনা ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়লে সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চায় না। তাকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে বিচার বসলে সে সরল, দ্বিধাহীন চিত্তে সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে যায়। গ্রামের এক বৃদ্ধ বলে, মুনিয়ার অনাগত সন্তান দেবতার দান। তাই সকলেই তাকে সাদরে গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যায়। এখানেই মহাভারতের কুন্তীর সঙ্গে ভিন্ন হয়ে যায় প্রান্তিক জনজাতির কুন্তীর আখ্যান।

মহাভারতের কুন্তীর পুত্র ছিল আক্ষরিক অর্থেই 'দেবতার দান'। রাজকুমারী কুন্তীর সেবায় তুষ্ট হয়ে ঋষি দুর্বাসা তাঁকে যে বর দিয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সূর্যকে আহ্বান করে কুন্তী লাভ করেছিলেন কর্ণকে। মহাভারতের যুগে কানীন পুত্রের সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেও কোনো এক অজানা আশঙ্কায় পুত্রকে নিজের কাছে রাখতে পারেননি কুন্তী। অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে লেখা এই গল্পের মুনিয়া সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে মহাভারতের কুন্তীর থেকে অনেক নিম্নস্তরে অবস্থান করলেও সন্তানকে ত্যাগ করার কথা ভাবেনি। আদিবাসী জনসমাজের নিজস্ব রীতিনীতি, বিশ্বাস ও সংস্কার মুনিয়াকে নিজের মাতৃধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে সহায়তা করেছে। এখানে চরিত্র ও কাহিনিগত দিক থেকে সমরেশ বসুর ছোটোগল্পে মহাভারতের বিনির্মাণ ঘটে গেছে।

কর্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিক প্রেক্ষাপটে লেখা আরও দু-টি উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্প হল **জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'কর্ণ-কুন্তী কথা'** [প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৮] এবং **অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অধিরথ সূতপুত্র'** [প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৬৪]। কথাসাহিত্যে কর্ণ চরিত্রের উল্লিখন ঘটেছে মূলত আত্মপরিচয়ের সংকটকে

প্রকটিত করতে। একজন তথাকথিত সফল এবং মহাবীর যোদ্ধার পূর্ণ অস্তিত্ব প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্তীর কাছ থেকে কর্ণ জানতে পারেন তাঁর এতদিনের সূতপুত্রের পরিচয় মিথ্যা। এতদিন যে অর্জুনকে তিনি সবথেকে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবেচনা করে এসেছেন, তিনি তাঁরই সহোদর অনুজ। কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাবে শেষপর্যন্ত রাজি হননি ঠিকই, কিন্তু এতদিনের লালিত বিশ্বাসে আঘাত লাগায় মানসিকভাবে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। কর্ণ চরিত্রের এই মনস্তত্ত্ব নবভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে **জ্যোতির্ময়ী দেবীর** (১৮৯৬-১৯৮৮) **'কর্ণ-কুন্তী কথা'** গল্পে।

'গল্পভারতী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় **'কর্ণ-কুন্তী কথা'** প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে দেখা যায়, প্রথিতযশা ডাক্তার সুদেব সরকার হঠাৎই একদিন জানতে পারে তার আসল নাম সুদেব চক্রবর্তী, পিতা শশাঙ্কমোহন চক্রবর্তী। ছোটোবেলা থেকে যাকে সে 'কাকা' বলে জেনে এসেছে; তিনি আসলে রক্তসম্পর্কে তার কেউ হন না। প্রায় সাতাশ বছর আগে শিশুপুত্রসহ সুদেবের বিধবা মাকে তিনি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুদেবের সমগ্র অস্তিত্ব এই ঘটনার পর একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়। তার মা কোন্ পরিস্থিতিতে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; একথা জানার পরেও তার মন শান্ত হতে পারে না। সুদেবের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেছেন লেখক— 'অসংখ্য নিঃশব্দ প্রশ্ন-উত্তরের যেন অদৃশ্য নীরব বিচারসভা বসেছিল ঘরে। কে বিচারকর্তা, সুদেব? কিসের বিচার? দয়া করার?'[১১]

মহাভারতে কর্ণের কাছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁর মাতা। এখানে সুদেবের মায়ের অজ্ঞাতেই সেই দায়িত্ব পালন করেছেন তার তথাকথিত কাকা। তারপর থেকে কাকা ও মায়ের সম্পর্ককে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে সুদেব। তার মা কেন প্রকৃত পিতার পদবি ব্যবহার করার বদলে আশ্রয়দাতার পদবি ব্যবহার করেছিলেন, কাকা এতবছর ধরে কেন অবিবাহিত আছেন, তার মা এই সংসার ছেড়ে যাবার কথা কখনও ভাবেননি কেন— এই সব হাজার প্রশ্ন ভিড় করে আসে তার মাথায়। আর ক্রমশ মায়ের সঙ্গে হাজার যোজন মানসিক দূরত্ব তৈরি হয় ছেলের।

উচ্চশিক্ষিত সুদেব নিজেদের পুরাণ, ধর্ম, ইতিহাস থেকে নিজের সপক্ষে দৃষ্টান্ত খুঁজে সান্ত্বনা পেতে চায়। 'পুরাণের কথা ভাবে— কত কথা— ব্যাস-সত্যবতী, কর্ণ-কুন্তী, বৃহস্পতি-তারা, জবালা, অহল্যা।'[১২] এই যে পৌরাণিক নামগুলি পরপর ব্যবহার করেছেন লেখক, প্রত্যেকেই সামাজিকভাবে অস্বীকৃত কিছু সম্পর্কের দায়ভার বহন করে থাকেন। তবে সুদেবের পরিস্থিতি এঁদের থেকে কিছু ভিন্ন। সত্যবতী, কুন্তী দু-জনেই কুমারী মাতা। তবে পরাশর পুত্র ব্যাসের সঙ্গে তাঁর মা সত্যবতীর সম্পর্ক অনেক সহজ ও নির্ভার। পরিচয় গোপনের কোনো গ্লানি নেই সেখানে। অন্যদিকে কুন্তী ও কর্ণের সম্পর্ক প্রথমাবধি গোপনীয়তার কালিমালিপ্ত। মহাভারত নতুন করে বিশ্লেষিত হয়েছে সুদেবের ভাবনায়—

> "মনে হয়, ব্যাস যেন সত্যবতীকে ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণ কুন্তীকে সহ্য করেননি, ক্ষমাও করেননি, স্বীকারও করেননি। আর নিজের জীবনযাত্রাও স্বীকার করে নিতে পারেননি, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর কুন্তী? কুন্তী রাজ্য পাওয়া ছেলেদের কাছে থাকেননি। বনে গিয়েছিলেন। দাবানলে পুড়ে মরেছিলেন। সে দাবানল কি মনের? কর্ণের ধিক্কারের?"[১৩]

কুন্তী লোকলজ্জার ভয়ে বাধ্য হয়ে প্রথম পুত্রকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। অন্যদিকে সুদেবের মা লোকসমাজে জবাবদিহি এড়াতে সুদেবের পিতৃপরিচয় গোপন রেখেছেন। কর্ণ যেমন কোনোদিন মাকে ক্ষমা

করতে পারেননি বলেই 'নিষ্ফলের, হতাশের দলে' থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; সুদেব তেমনই মা আর কাকার সংসার ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কাকার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে যথাবিধি কর্তব্য সম্পাদন করে সে মাকে কাশীবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এখানেই মহাভারতের কুন্তী-কর্ণের থেকে ভিন্ন হয়ে যায় সুদেব ও তার মায়ের আখ্যান। কুন্তী জন্মমুহূর্তেই পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু সুদেবের মা শত প্রতিকূলতাতেও পুত্রকে ত্যাগ করেননি। আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে সুদেব যে আশঙ্কা করেছিল, তাও সর্বৈব অমূলক। তারপরেও সুদেব তার মাকে ক্ষমা করতে পারেনি। অস্তিত্বের সংকট থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে তার অভিমানাহত হৃদয় মাকে আঘাত করার পথ বেছে নিয়েছে।

কাশীতে নির্বাসিত সুদেবের মাকে আজীবন নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা বহন করতে হয়েছে। মৃত্যুর আগেও তিনি পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন না। ছেলের পরিচয় গোপন রাখার জন্যই যেন তাঁর এই শাস্তিভোগ। মহাভারতেও দেখা যায়, কুন্তী দাবানলে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। কর্ণের মৃত্যুর পরে স্ত্রীপর্বে কুন্তী তাঁর বাকি পুত্রদের কাছে কর্ণের পরিচয় প্রকাশ করে তর্পণাদি করতে বলেছিলেন। আলোচ্য গল্পে সুদেব মায়ের মৃত্যুর পর কাশীতে শ্রাদ্ধ করার সময় পুরোহিতের কাছে প্রথমবার নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেছে। এভাবে মহাভারতের বিপরীত ছবি এঁকে লেখক তাঁর 'কর্ণ-কুন্তী কথা' গল্পে আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯) তাঁর **'অধিরথ সূতপুত্র'** গল্পে দেশভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত এক যুবকের অনিকেত সত্তার সঙ্গে একীভূত করে দিয়েছেন মহাভারতের কর্ণের শিকড়চ্যুত ভাবমূর্তিটিকে। দেশভাগ পরবর্তীকালে বিধবা মা ও দুই বোনকে নিয়ে সনাতন পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। আন্দোলনে জর্জর কলকাতাকে দেখে তার মনে হয় 'কুরুক্ষেত্র'। শুধুমাত্র জাতিগত পরিচয় 'হিন্দু' হবার সুবাদে সনাতনকে এতদিনের চেনা দেশমাতৃকার ওপর থেকে নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছিল, সঙ্গে জুটেছিল 'রিফিউজি' তকমা। সেই পরিস্থিতিতে সনাতনের মনে হয়েছিল, সে এক 'কুলপরিচয়শূন্য জারজ সন্তান'[১৪]। এভাবে 'অধিরথ সূতপুত্র' গল্পে কর্ণ-কুন্তীর সম্পর্ক আরও বিস্তৃত আকাশ পেয়ে যুগগত ব্যাপ্তি লাভ করেছে। মহাভারতের কুমারী মাতা এবং তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রের প্রতীকে উঠে এসেছে দেশমাতৃকা এবং তাঁর রিফিউজি সন্তানের আখ্যান।

প্রেমিকা নাজমাকে উদ্দেশ্য করে সনাতন নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করেছে— "আজন্মকাল যাহাকে পরম বিশ্বাসে মাতা বলিয়া জানিয়াছি, আজ চিনিলাম— তিনিই আমার বিমাতা। অথচ নবলব্ধ স্বদেশ-গৃহে আমার জন্য কোনো আশ্রয় নির্ধারিত হয় নাই। প্রেম নাই, ভালোবাসা নাই, মনুষ্যত্ব নাই।"[১৫] ঠিক যেভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কর্ণ জানতে পেরেছিলেন অধিরথ-পত্নী রাধা তাঁর মাতা নন। দুর্দিনের সুহৃদ দুর্যোধনকে ছেড়ে পাণ্ডবভ্রাতাদের পক্ষে যোগ দিতে মন সায় দেয়নি তাঁর। অথচ সমগ্র যুদ্ধের উদ্দেশ্যটাই একমুহূর্তে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে।

আলোচ্য গল্পে অর্থের প্রয়োজনে সনাতন একটি ফার্মের বেআইনি কাজে অংশগ্রহণ করতে কোম্পানির অফিসে এসে উপস্থিত হয়। সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে তার মনে হয়— 'কুরুক্ষেত্র কলকাতার নিভৃতে এক আলাদা জগৎ', ঠিক যেন 'দুর্যোধনের গোপন শিবির'[১৬]।

আজন্মলালিত 'অধিরথ সূতপুত্র'-এর পরিচয় মিথ্যা বলে জানার পর কর্ণ আজীবন নিজের মাকে খুঁজে ফিরেছেন। এবং শেষপর্যন্ত চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের মাকে গর্ভধারিণী বলে জানার পর, তাঁর সমগ্র জীবনকেই 'জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম'[১৭] মাত্র বলে মনে হয়েছে। সনাতনও ঘর হারিয়ে, দেশ হারিয়ে প্রকৃত জন্মভূমির সন্ধান করে ফিরেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। নিঃসঙ্গ কর্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অর্জুনের থেকে মৃত্যুবাণ গ্রহণ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে অমলেন্দুর গল্পে সনাতন ট্রেনের তলায় মাথা রেখে আত্মহত্যা করেছে। অধ্যাপক প্রসূন ঘোষ আলোচ্য গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> "দেশভাগের পটভূমিতে লেখা 'অধিরথ সূতপুত্র' গল্পের মূল থীম প্রতিকূল পরিবেশে নিজ পরিচয় সন্ধান। সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে উৎসভূমি থেকে নিদারুণভাবে পরিত্যক্ত সনাতনের সংকটের বহুমাত্রিক দিককে চিহ্নিত করেছেন লেখক।"[১৮]

এভাবে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জাতির কল্পসৃষ্টি মহাভারত যুগে যুগে নতুনভাবে চর্চিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও মতাদর্শ থেকে মহাভারত-চর্চা করায় কর্ণ চরিত্রের বিবর্তন ঘটে গেছে। আধুনিক যুগের কর্ণ কখনো দেশভাগের কারণে, কখনো মায়ের স্বার্থপরতার কারণে, আবার কখনো মিথ্যা পরিস্থিতির শিকার হয়ে অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছে। একালের গল্পকারেরা বহু ছোটোগল্পেই মহাভারতীয় মিথের প্রতীকী ব্যবহার করেছেন। ভীষ্ম, কুন্তী, দ্রৌপদী, কর্ণ, যুধিষ্ঠির প্রমুখ মহাভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি থেকে উক্ত লেখকেরা ভাবনার রসদ সংগ্রহ করেছেন। তারপর নিজস্ব শৈলী ও জীবনবীক্ষার প্রয়োগে গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র রচনা।

মহাভারতের সময় ও বর্তমান সময়কে মিলিয়ে দেওয়ায় এই সব ছোটোগল্পে মহাভারতের অভিনব পাঠ গড়ে উঠেছে। ক্লাসিক সাহিত্যের পরিচিত ঘটনা বা চরিত্রের উল্লেখে পাঠকমননে সহজেই অভিঘাত সৃষ্টি হয়। দীর্ঘলালিত ঐতিহ্যসূত্রে মহাভারতের উত্তরাধিকার ভারতীয় তথা বাঙালি হিসেবে আমরা বহন করে নিয়ে চলেছি। সেই জাতীয় ঐতিহ্যের ফসল বলেই এই জাতীয় কথাসাহিত্যের সঙ্গে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করতে পারে। বাঙালির মহাভারত-চর্চার ইতিহাসে আলোচ্য ছোটোগল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

তথ্যসূত্র:

1. বসু, রাজশেখর, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ', এমসরকার .সি . অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ,কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৪১৪, পৃ ৩৫২।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', সঞ্চয়িতা, ইস্ট ইন্ডিয়া পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০২, পৃ ৩১৩।
3. তদেব, পৃ ৩১৬।
4. তদেব, পৃ ৩১৬।
5. তদেব, পৃ ৩১৭।
6. তদেব, পৃ ৩১১।
7. ঘোষ, সুবোধ, 'কৌন্তেয়', গল্পসমগ্র ১, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ ৪১৮।
8. তদেব, পৃ ৪১৯।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৩।
10. ঘোষ, সুবোধ, 'কৌন্তেয়', গল্পসমগ্র ১, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃ ৪২০।
11. দেবী, জ্যোতির্ময়ী, 'কর্ণ-কুন্তী কথা', জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ৪, গৌরকিশোর ঘোষ সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০২১, পৃ ৪১৫।
12. তদেব, পৃ ৪১৫।
13. তদেব, পৃ ৪১৬।
14. চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'অধিরথ সূতপুত্র', দাঙ্গা ও দেশভাগের গল্প, সুদিন চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দাশ সম্পাদিত, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ৩৩৩।
15. তদেব, পৃ ৩৩৩।
16. তদেব, পৃ ৩৩৫।
17. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্ণকুন্তীসংবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ ৩১৭।
18. ঘোষ, প্রসূন, 'একালের ছোটগল্পে মহাভারত প্রসঙ্গ', কোরক সাহিত্য পত্রিকা, তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, শারদীয় ২০১৪, পৃ ২৬৩।